একত্রিংশতি অধ্যায়

প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

তত উৎপন্নবিজ্ঞানা আশ্বধোক্ষজভাষিতম্ ।
স্মরন্ত আত্মজে ভার্যাং বিসৃজ্য প্রাব্রজন্ গৃহাৎ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ততঃ**—তারপর; **উৎপন্ন**—উদিত; **বিজ্ঞানাঃ**—পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত হয়ে; **আশু**—অতি শীঘ্র; **অধোক্ষজ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **ভাষিতম্**—বাণী; **স্মরন্তঃ**—স্মরণ করে; **আত্ম-জে**—তাঁদের পুত্রের নিকট; **ভার্যাম্**—তাঁদের পত্নী; **বিসৃজ্য**—সমর্পণ করে; **প্রাব্রজন্**—বহির্গত হয়েছিলেন; **গৃহাৎ**—গৃহ থেকে।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—প্রচেতারা বহু সহস্র বৎসর গৃহে অবস্থান করেছিলেন, এবং তারপর তাঁদের দিব্য জ্ঞান উদিত হয়েছিল। তখন তাঁরা ভগবানের আশীর্বাদ স্মরণ করে এবং তাঁদের ভার্যাকে আদর্শ পুত্রের হস্তে সমর্পণপূর্বক গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

তপস্যান্তে প্রচেতারা পরমেশ্বর ভগবানের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। ভগবান তাঁদের এই বলে আশীর্বাদ করেছিলেন যে, তাঁদের গৃহস্থ-জীবনের পর তাঁরা যথাসময়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। দিব্য সহস্র বৎসর গৃহস্থ-জীবন যাপন করার পর, প্রচেতারা তাঁদের পত্নীকে দক্ষ নামক পুত্রের হস্তে অর্পণ করে গৃহত্যাগ করতে মনস্থ করেছিলেন। এটিই হচ্ছে বৈদিক সভ্যতা। জীবনের শুরুতে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্য ব্রহ্মচারীরূপে কঠোর তপস্যা করতে হয়। মেয়েদের সঙ্গে

ব্রহ্মচারীদের মেলামেশা করতে দেওয়া হয় না এবং জীবনের শুরু থেকেই যৌনসুখ সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করতে দেওয়া হয় না। আধুনিক সভ্যতার সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের স্কুল এবং কলেজ জীবনেই যৌন জীবন উপভোগ করার স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ সন্তানই বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ 'অবাঞ্ছিত পিতামাতা থেকে উৎপন্ন'। তার ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে মানব-সভ্যতা বৈদিক নিয়মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, জীবনের প্রারম্ভে ছেলে-মেয়েরা তপস্যা করবে। যখন তারা প্রাপ্তবয়স্ক হবে, তখন তারা বিবাহ করবে এবং কিছুকালের জন্য গৃহে অবস্থান করে সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করবে। তারপর সন্তানেরা যখন বড় হয়ে যাবে, মানুষ তখন গৃহত্যাগ করে কৃষ্ণভাবনামৃতের অন্বেষণ করবে। এইভাবে ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তন করে মানুষ তার জীবন সার্থক করতে পারে।

বিদ্যার্থীর জীবনে যদি তপস্যা না করা হয়, তা হলে ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি না করে জীবন সার্থক করা যায় না। অতএব মূল কথা হচ্ছে যে, সন্তানেরা বড় হয়ে গেলে তাদের তত্ত্বাবধানে পত্নীকে রেখে, কৃষ্ণভাবনামৃতের বিকাশের জন্য পতি গৃহত্যাগ করতে পারে। সবকিছুই নির্ভর করে উন্নত জ্ঞানের বিকাশের উপর। প্রচেতাদের পিতা রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ জলের ভিতরে তপস্যারত পুত্রদের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই গৃহত্যাগ করেছিলেন। সময় উপযুক্ত হলে, অথবা পূর্ণ কৃষ্ণভক্তির বিকাশ হলে, সমস্ত দায়-দায়িত্বগুলি সম্পাদন না হলেও, গৃহত্যাগ করা উচিত। প্রাচীনবর্হিষৎ তাঁর পুত্রদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা করছিলেন, কিন্তু নারদের উপদেশে যখন তাঁর বুদ্ধি যথাযথভাবে বিকশিত হয়েছিল, তখন তিনি কেবল তাঁর মন্ত্রীদের কাছে তাঁর পুত্রদের প্রতি আদেশ রেখে, তাঁদের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষা না করে, গৃহত্যাগ করেছিলেন।

সুখদায়ক গৃহস্থ-জীবন পরিত্যাগ করা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন, *হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপম্*—সংসার জীবনের সমাপ্তি সাধনের জন্য তথাকথিত সুখদায়ক গৃহস্থ-জীবন, যা কেবল আত্মাকে হনন করার উপায় মাত্র (*আত্ম-পাতম্*), তা ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য। গৃহকে ঘাসপাতায় ঢাকা অন্ধকূপ বলে মনে করা হয়, এবং কেউ যদি এই অন্ধকূপে পতিত হয়, তা হলে কারও সাহায্য বিনা তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাই গৃহস্থ-জীবনের প্রতি অধিক আসক্ত হওয়া উচিত নয়, কারণ তার ফলে কৃষ্ণভক্তির প্রগতি প্রতিহত হবে।

শ্লোক ২

দীক্ষিতা ব্রহ্মসত্রেণ সর্বভূতাত্মমেধসা ।
প্রতীচ্যাং দিশি বেলায়াং সিদ্ধোঽভূদ্‌যত্র জাজলিঃ ॥ ২ ॥

দীক্ষিতাঃ—কৃতসংকল্প হয়ে; **ব্রহ্ম-সত্রেণ**—পরমাত্ম জ্ঞানের দ্বারা; **সর্ব**—সমস্ত; **ভূত**—জীব; **আত্ম-মেধসা**—নিজের মতো বলে মনে করে; **প্রতীচ্যাম্**—পশ্চিম; **দিশি**—দিকে; **বেলায়াম্**—সমুদ্রতটে; **সিদ্ধঃ**—সিদ্ধি; **অভূৎ**—লাভ করেছিলেন; **যত্র**—যেখানে; **জাজলিঃ**—মহর্ষি জাজলি।

অনুবাদ

প্রচেতারা পশ্চিম দিকে সমুদ্রতটে গিয়েছিলেন, যেখানে জীবন্মুক্ত মহর্ষি জাজলি অবস্থান করছিলেন। যেই দিব্য জ্ঞানের দ্বারা সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হওয়া যায়, পূর্ণরূপে সেই জ্ঞান লাভ করে প্রচেতারা কৃষ্ণভক্তিতে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মসত্র শব্দটির অর্থ, 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন'। প্রকৃতপক্ষে *বেদ* এবং কঠোর তপস্যা উভয়কেই বলা হয় *ব্রহ্ম। বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম। ব্রহ্ম* শব্দের আর একটি অর্থ হচ্ছে 'পরমতত্ত্ব'। পরম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হয় *বেদ* অধ্যয়ন এবং তপস্যার অনুশীলনের দ্বারা। প্রচেতারা সেই কার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করেছিলেন এবং তার ফলে তাঁরা সমস্ত জীবের প্রতি সমভাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই কথা *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যে ব্যক্তি এইভাবে দিব্য স্থিতিতে অবস্থিত, তিনি তৎক্ষণাৎ পরমব্রহ্মকে উপলব্ধি করে পূর্ণরূপে প্রসন্ন হন। তিনি কখনও কোন কিছুর জন্য শোক করেন না অথবা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সর্বভূতের প্রতি সমভাবাপন্ন। এই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।"

কেউ যখন প্রকৃতপক্ষে পারমার্থিক উন্নতি লাভ করেন, তখন তিনি বিভিন্ন জীবের মধ্যে কোন ভেদ দর্শন করেন না। এই পথ দৃঢ়সংকল্পের দ্বারা লাভ করা যায়। যখন প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হয়, তখন তিনি আর জীবের বাহ্যিক আবরণ

দর্শন করেন না। তখন তিনি দেহের অভ্যন্তরে আত্মাকে দর্শন করেন। তার ফলে তিনি আর মানুষ ও পশু এবং ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেন না।

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ পণ্ডিত তাঁর প্রকৃত জ্ঞানের প্রভাবে, একজন বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৫/১৮)

বিদ্বান ব্যক্তি সকলকেই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ভিত্তিতে সমভাবে দর্শন করেন, এবং প্রকৃত পণ্ডিত বা ভগবদ্ভক্ত চান যে, সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তির বিকাশ করেন। প্রচেতারা যেখানে বাস করছিলেন, সেই স্থানটি আধ্যাত্মিক কার্য সম্পাদনের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত ছিল, কারণ মহর্ষি জাজলি সেখানে মুক্তিলাভ করেছিলেন। সিদ্ধি অথবা মুক্তিলাভের অভিলাষী ব্যক্তিদের জীবন্মুক্ত ব্যক্তির সঙ্গ করা কর্তব্য। তাকে বলা হয় সাধুসঙ্গ বা আদর্শ ভক্তের সঙ্গ।

শ্লোক ৩

তান্নির্জিতপ্রাণমনোবচোদৃশো
জিতাসনান্ শান্তসমানবিগ্রহান্ ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি যোজিতাত্মনঃ
সুরাসুরেড্যো দদৃশে স্ম নারদঃ ॥ ৩ ॥

তান্—তাঁরা সকলে; **নির্জিত**—পূর্ণরূপে সংযত; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু (প্রাণায়ামের দ্বারা); **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **দৃশঃ**—দৃষ্টি; **জিত-আসনান্**—আসনে জয়পূর্বক; **শান্ত**—শান্ত; **সমান**—ঋজু; **বিগ্রহান্**—যাঁদের শরীর; **পরে**—দিব্য; **অমলে**—সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **যোজিত**—যুক্ত; **আত্মনঃ**—যাঁদের মন; **সুর-অসুর-ঈড্যঃ**—দেবতা এবং অসুরদের দ্বারা পূজিত; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **নারদঃ**—নারদ মুনি।

অনুবাদ

প্রচেতারা যোগাসন অভ্যাস করে তাঁদের প্রাণবায়ু, মন, বাণী এবং বাহ্যদৃষ্টি সংযত করেছিলেন। এইভাবে প্রাণায়ামের দ্বারা তাঁরা সম্পূর্ণরূপে সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। ঋজুভাবে উপবিষ্ট হয়ে তাঁরা পরমব্রহ্মে তাঁদের

মনকে একাগ্রীভূত করেছিলেন। তাঁরা যখন এইভাবে প্রাণায়াম অভ্যাস করছিলেন, তখন দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত নারদ মুনি তাঁদের দেখতে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *পরে অমলে* শব্দ দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক। *শ্রীমদ্ভাগবতে* ব্রহ্ম-উপলব্ধির বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরমতত্ত্ব তিনভাবে উপলব্ধ হয়—নির্বিশেষ জ্যোতি (ব্রহ্ম), অন্তর্যামী পরমাত্মা এবং পরমেশ্বর ভগবান। শিব তাঁর প্রার্থনায় পরমব্রহ্মের সবিশেষরূপে মনকে একাগ্রীভূত করে, তাঁর রূপকে *স্নিগ্ধপ্রাবৃড়্ঘনশ্যামম্* বলে বর্ণনা করেছেন (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৪/২৪/৪৫)। শিবের নির্দেশ অনুসারে প্রচেতারাও তাঁদের মনকে ভগবানের শ্যামসুন্দর রূপে একাগ্রীভূত করেছিলেন। যদিও নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা ব্রহ্ম এবং পরম পুরুষরূপে ব্রহ্ম—সবই একই চিন্ময় স্তরে, তবুও পরব্রহ্মের সবিশেষ রূপ হচ্ছে চিন্ময় স্তরের সর্বোচ্চ লক্ষ্য এবং চরম প্রকাশ।

নারদ মুনি সর্বত্র ভ্রমণ করেন। তিনি অসুর ও দেবতা উভয়ের কাছেই যান এবং তারা উভয়েই তাঁকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করে। তাই এখানে তাঁকে *সুরাসুরেড্য,* সুর এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা পূজিত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ মুনির কাছে প্রতিটি গৃহের দরজাই উন্মুক্ত। অসুর এবং দেবতাদের মধ্যে যদিও চিরশত্রুতা রয়েছে, তবুও নারদ মুনিকে সর্বত্রই সমাদর করা হয়। নারদ মুনিকে একজন দেবতা বলে মনে করা হয়, এবং তাই তাঁকে দেবর্ষি বলা হয়। কিন্তু অসুরেরাও নারদ মুনির প্রতি হিংসা করে না; তাই তিনি দেবতা এবং অসুর উভয়েরই দ্বারা সমানভাবে পূজিত হন। আদর্শ বৈষ্ণবের স্থিতি ঠিক নারদ মুনির মতো হওয়া উচিত, সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ।

শ্লোক ৪

তমাগতং ত উত্থায় প্রণিপত্যাভিনন্দ্য চ ।
পূজয়িত্বা যথাদেশং সুখাসীনমথাব্রুবন্ ॥ ৪ ॥

তম্—তাঁকে; **আগতম্**—আগত; **তে**—প্রচেতারা; **উত্থায়**—উঠে; **প্রণিপত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **অভিনন্দ্য**—স্বাগত জানিয়ে; **চ**—ও; **পূজয়িত্বা**—পূজা করে; **যথা আদেশম্**—বিধিপূর্বক; **সুখ-আসীনম্**—সুখে উপবিষ্ট; **অথ**—এইভাবে; **অব্রুবন্**—তাঁরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনিকে আসতে দেখে প্রচেতারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন। বিধিপূর্বক তাঁরা প্রণতি নিবেদন করে তাঁর পূজা করেছিলেন, এবং যখন তাঁরা দেখলেন যে তিনি সুখে আসন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রচেতারা যে পরমেশ্বর ভগবানে মন একাগ্র করার জন্য যোগ অভ্যাস করছিলেন তা উল্লেখযোগ্য।

শ্লোক ৫

প্রচেতস উচুঃ

স্বাগতং তে সুরর্ষেঽদ্য দিষ্ট্যা নো দর্শনং গতঃ ।
তব চঙ্ক্রমণং ব্রহ্মন্নভয়ায় যথা রবেঃ ॥ ৫ ॥

প্রচেতসঃ উচুঃ—প্রচেতারা বললেন; **সু-আগতম্**—স্বাগত; **তে**—আপনাকে; **সুর-ঋষে**—হে দেবর্ষি; **অদ্য**—আজ; **দিষ্ট্যা**—সৌভাগ্যক্রমে; **নঃ**—আমাদের; **দর্শনম্**—দর্শন; **গতঃ**—আপনি এসেছেন; **তব**—আপনার; **চঙ্ক্রমণম্**—পর্যটন; **ব্রহ্মন্**—হে মহান ব্রাহ্মণ; **অভয়ায়**—অভয়ের জন্য; **যথা**—যেমন; **রবেঃ**—সূর্যের।

অনুবাদ

প্রচেতারা নারদ মুনিকে সম্বোধন করে বললেন—হে দেবর্ষি, হে ব্রাহ্মণ! আশা করি এখানে আসার সময় আপনার কোন অসুবিধা হয়নি। আমাদের পরম সৌভাগ্যের ফলে আমরা আপনার দর্শন লাভ করেছি। সূর্যদেবের ভ্রমণ যেমন মানুষকে রাত্রির অন্ধকারের ভয় থেকে, দস্যু-তস্করদের ভয় থেকে মুক্ত করে, তেমনই আপনার পর্যটনও সূর্যের মতো, কারণ আপনি সমস্ত ভয় দূর করেন।

তাৎপর্য

রাত্রির অন্ধকারে সকলেই দস্যু-তস্করদের ভয়ে ভীত হয়, বিশেষ করে বড় বড় শহরে। মানুষেরা রাস্তায় বেরোতে ভয় পায়, এবং আমরা দেখেছি যে, নিউইয়র্কের মতো বড় শহরেও মানুষ রাত্রে বেরোতে চায় না। শহরেই হোক অথবা গ্রামেই

হোক, রাত্রিবেলা সকলেরই কিছু না কিছু ভয় হয়। কিন্তু সূর্যের উদয় হওয়া মাত্রই সকলেই আশ্বস্ত হয়। তেমনই এই জড় জগৎ স্বভাবতই অন্ধকার। সকলেই প্রতিক্ষণ বিপদের ভয়ে ভীত, কিন্তু কেউ যখন নারদ মুনির মতো ভক্তের দর্শন লাভ করেন, তখন তাঁর সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। সূর্য যেমন অন্ধকার দূর করে, নারদ মুনির মতো মহান ঋষির আগমনে অজ্ঞান দূর হয়ে যায়। কেউ যখন মুনি অথবা তাঁর প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন তিনি অজ্ঞানজনিত সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ৬

যদাদিষ্টং ভগবতা শিবেনাধোক্ষজেন চ ।
তদ্ গৃহেষু প্রসক্তানাং প্রায়শঃ ক্ষপিতং প্রভো। ॥ ৬ ॥

যৎ—যা; **আদিষ্টম্**—উপদেশ দেওয়া হয়েছিল; **ভগবতা**—মহাপুরুষ; **শিবেন**—শিবের দ্বারা; **অধোক্ষজেন**—ভগবান বিষ্ণুর দ্বারা; **চ**—ও; **তৎ**—তা; **গৃহেষু**—পারিবারিক বিষয়ের প্রতি; **প্রসক্তানাম্**—অত্যন্ত আসক্ত আমাদের দ্বারা; **প্রায়শঃ**—প্রায়; **ক্ষপিতম্**—বিস্মৃত; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

হে প্রভু! গৃহের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হওয়ার ফলে, শিব এবং ভগবান শ্রীবিষ্ণুর কাছ থেকে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলাম, তা প্রায় ভুলে গেছি।

তাৎপর্য

গৃহস্থ-আশ্রম ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের এক প্রকার অনুমোদন। মানুষের বোঝা উচিত যে, ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের আবশ্যকতা নেই, কিন্তু মানুষ যতক্ষণ বেঁচে থাকে ততক্ষণ তাকে কিছু না কিছু ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ স্বীকার করতে হয়। *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/২/১০) প্রতিপন্ন হয়েছে—*কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতিঃ* । গোস্বামী হয়ে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করা উচিত। ইন্দ্রিয়গুলিকে কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্যই ব্যবহার করা উচিত নয়; পক্ষান্তরে জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই কেবল ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহার করা উচিত। শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন—*অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ* । ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আসক্ত হওয়া উচিত

নয়, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ স্বীকার করা উচিত নয়। কেউ যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে চায়, তা হলে সে সংসার জীবনের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ে, যার অর্থ হচ্ছে বন্ধন। প্রচেতারা গৃহস্থ-আশ্রমে থাকার ফলে তাঁদের যে ভুল হয়েছে, তা স্বীকার করেছিলেন।

শ্লোক ৭

তন্নঃ প্রদ্যোতয়াধ্যাত্মজ্ঞানং তত্ত্বার্থদর্শনম্ ।
যেনাঞ্জসা তরিষ্যামো দুস্তরং ভবসাগরম্ ॥ ৭ ॥

তৎ—তাই; **নঃ**—আমাদের জন্য; **প্রদ্যোতয়**—কৃপা করে জাগরিত করুন; **অধ্যাত্ম**—দিব্য; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **তত্ত্ব**—পরমতত্ত্ব; **অর্থ**—উদ্দেশ্যে; **দর্শনম্**—দর্শন; **যেন**—যার দ্বারা; **অঞ্জসা**—অনায়াসে; **তরিষ্যামঃ**—আমরা উত্তীর্ণ হতে পারি; **দুস্তরম্**—দুরতিক্রম্য; **ভব-সাগরম্**—অবিদ্যার সমুদ্র।

অনুবাদ

হে প্রভু! দয়া করে আমাদের দিব্য জ্ঞানের আলোক প্রদান করুন, যা প্রদীপস্বরূপ, এবং যার দ্বারা আমরা অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে পারি।

তাৎপর্য

প্রচেতারা নারদ মুনিকে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। সাধারণত যখন কোন সাধারণ ব্যক্তি কোন মহাত্মার দর্শন লাভ করে, তখন সে তাঁর কাছ থেকে কোন জড়-জাগতিক আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কিন্তু প্রচেতারা কোন জড়-জাগতিক লাভের প্রতি আগ্রহী ছিলেন না, কারণ তাঁরা তা যথেষ্ট পরিমাণে উপভোগ করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের জড় বাসনা চরিতার্থ করতে চাননি। তাঁরা কেবল ভবসাগর উত্তীর্ণ হতে আগ্রহী ছিলেন। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে এই ভববন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করা। এই বিষয়ে জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে সাধু মহাত্মার শরণাগত হওয়া। জড়সুখ ভোগের জন্য আশীর্বাদ লাভের আশায় সাধুদের বিরক্ত করা উচিত নয়। সাধারণত গৃহস্থেরা তাদের গৃহে সাধুদের স্বাগত জানায় তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভের জন্য, কিন্তু তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জড় জগতে সুখভোগ করা। এই প্রকার জড়-জাগতিক আশীর্বাদ লাভের প্রার্থনা করা শাস্ত্রে অনুমোদিত হয় নি।

শ্লোক ৮

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসাং পৃষ্টো ভগবান্নারদো মুনিঃ ।
ভগবত্যুত্তমশ্লোক আবিষ্টাত্মাব্রবীন্নৃপান্ ॥ ৮ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **ভগবান্**—ভগবানের মহান ভক্ত; **নারদঃ**—নারদ; **মুনিঃ**—অত্যন্ত চিন্তাশীল; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবানে; **উত্তম-শ্লোকে**—সর্বোৎকৃষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন; **আবিষ্ট**—মগ্ন; **আত্মা**—যাঁর মন; **অব্রবীৎ**—উত্তর দিয়েছিলেন; **নৃপান্**—রাজাদের।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে বিদুর! প্রচেতাদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে পরম ভাগবত নারদ মুনি, যিনি সর্বদা উত্তমশ্লোক ভগবানে আসক্তচিত্ত, তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *ভগবান্ নারদঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, নারদ মুনি সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। *ভগবত্যুত্তমশ্লোক আবিষ্টাত্মা* । ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করা, শ্রীকৃষ্ণের কথা বলা এবং শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচার করা ছাড়া নারদ মুনির আর অন্য কোন কাজ নেই, তাই কখনও কখনও তাঁকে *ভগবান্* বলা হয়। *ভগবান্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ'। কেউ যখন তাঁর ভক্তির প্রভাবে ভগবানকে তাঁর হৃদয়ে প্রাপ্ত হন, তখন তাঁকেও কখনও কখনও ভগবান বলা হয়। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন, *সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈঃ*—প্রত্যেক শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান বলে স্বীকার করা হয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, শ্রীগুরুদেব অথবা নারদ মুনির মতো মহাত্মা প্রকৃতপক্ষে ভগবান হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁকে এইভাবে স্বীকার করা হয়, কারণ তাঁর হৃদয়ে ভগবান নিরন্তর বিরাজ করেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যখন কেউ কেবল শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকেন (*আবিষ্টাত্মা*), তাঁকেও ভগবান বলা হয়। ভগবান সর্ব ঐশ্বর্যসমন্বিত। ভগবান যদি সর্বদা কারও হৃদয়ে থাকেন, তা হলে তিনিও কি আপনা থেকেই সমস্ত ঐশ্বর্য লাভ করেন না? এই অর্থে নারদ মুনির মতো মহান ভক্তকেও ভগবান বলা

যেতে পারে। কিন্তু যখন কোন দুরাচারী ভণ্ডকে ভগবান বলা হয়, তখন আমরা তা সহ্য করতে পারি না। হয় তাকে সমস্ত ঐশ্বর্যের অধিকারি হতে হবে অথবা সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ পরমেশ্বর ভগবানের অধিকারি হতে হবে, তা হলেই কেবল তাকে ভগবান বলা যায়।

শ্লোক ৯

নারদ উবাচ

তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥

নারদঃ উবাচ—নারদ বললেন; **তৎ জন্ম**—সেই জন্ম; **তানি**—সেই সমস্ত; **কর্মাণি**—সকাম কর্ম; **তৎ**—তা; **আয়ুঃ**—আয়ু; **তৎ**—তা; **মনঃ**—মন; **বচঃ**—বাণী; **নৃণাম্**—মানুষদের; **যেন**—যার দ্বারা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **বিশ্ব-আত্মা**—পরমাত্মা; **সেব্যতে**—সেবিত হয়; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—যখন কোন জীব পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁর জন্ম, তাঁর সমস্ত কর্ম, তাঁর আয়ু, তাঁর মন এবং তাঁর বাণী—সবই প্রকৃতপক্ষে সার্থক হয়।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *নৃণাম্* শব্দটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনুষ্যজন্ম ব্যতীত অন্য বহু প্রকার জন্ম রয়েছে, কিন্তু নারদ মুনি এখানে বিশেষভাবে মনুষ্য-জন্মের কথা বলেছেন। মানব-সমাজে বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে। তাদের মধ্যে যাঁরা আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভক্তিতে উন্নত, তাঁদের বলা হয় আর্য। আর্যদের মধ্যে যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তাঁদের জীবন সবচাইতে সার্থক। *নৃণাম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, মনুষ্যেতর পশুরা যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হবে, তা আশা করা যায় না। কিন্তু আদর্শ মানব-সমাজে সকলেরই কর্তব্য ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। মানুষ ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক, সাদা হোক অথবা কালো হোক, তাতে কিছু যায় আসে না। মানব-সমাজে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে নানা প্রকার জড় বৈষম্য থাকতে পারে, কিন্তু সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায়

যুক্ত হওয়া। বর্তমান সভ্য দেশগুলি অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য ভগবৎ-চেতনা ত্যাগ করেছে। ভগবৎ-চেতনা বিকাশ করার জন্য তাদের কোন রকম আগ্রহ নেই। তাদের পূর্বপুরুষেরা ধর্ম অনুষ্ঠান করত। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, ইহুদি নির্বিশেষে সকলেই কোন না কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম হচ্ছে ভগবৎ-চেতনা লাভ করা। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তিতে আগ্রহী হন, তখনই তাঁর জন্ম সার্থক হয়। কেউ যখন ভগবানের সেবা করেন, তখন তাঁর কর্ম সার্থক হয়। দার্শনিক মতবাদ অথবা মনোধর্মী জ্ঞান তখনই সার্থক হয়, যখন তা ভগবানকে জানার ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি তখন ধন্য হয়, যখন তা ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভগবদ্ভক্তির অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। বর্তমানে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি শুদ্ধ নয়; তাই সেগুলি সমাজ, বন্ধুত্ব, প্রেম, রাজনীতি ইত্যাদির সেবায় যুক্ত। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন ভক্তি লাভ হয়। পরবর্তী শ্লোকে তার বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এক মহান ভক্ত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছিলেন—

"আজি মোর জন্ম-কর্ম—সকল সফল ।
আজি মোর উদয়—সকল সুমঙ্গল ॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার ।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা ।
তাঁরে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা ॥"

শ্লোক ১০

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ ।
কর্মভির্বা ত্রয়ীপ্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥ ১০ ॥

কিম্—কি লাভ; **জন্মভিঃ**—জন্মের; **ত্রিভিঃ**—তিন; **বা**—অথবা; **ইহ**—এই জগতে; **শৌক্র**—শুক্রের দ্বারা; **সাবিত্র**—দীক্ষার দ্বারা; **যাজ্ঞিকৈঃ**—পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ হওয়ার দ্বারা; **কর্মভিঃ**—কর্মের দ্বারা; **বা**—অথবা; **ত্রয়ী**—বেদে; **প্রোক্তৈঃ**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **পুংসঃ**—মানুষের; **অপি**—ও; **বিবুধ**—দেবতাদের; **আয়ুষা**—আয়ুতে।

অনুবাদ

সভ্য মানুষদের তিন প্রকার জন্ম হয়। প্রথম জন্মটি হচ্ছে শুদ্ধ পিতামাতা থেকে, এবং এই জন্মকে বলা হয় শৌক্র জন্ম। শ্রীগুরুদেবের কাছ থেকে যখন দীক্ষালাভ হয়, সেই জন্মকে বলা হয় সাবিত্র জন্ম। যখন ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করার সুযোগ হয়, তখন তাকে বলা হয় যাজ্ঞিক জন্ম। এই প্রকার জন্মগ্রহণের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, দেবতাদের মতো দীর্ঘ আয়ু লাভ করা সত্ত্বেও, কেউ যদি ভগবানের সেবায় যুক্ত না হয়, তা হলে সবকিছুই ব্যর্থ হয়ে যায়। তেমনই কারও কার্যকলাপ পার্থিব অথবা আধ্যাত্মিক হতে পারে, কিন্তু তা যদি ভগবানের সন্তুষ্টিবিধানের জন্য না হয়, তা হলে তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

তাৎপর্য

শৌক্র জন্মের অর্থ হচ্ছে 'পিতার ঔরসে মাতৃজঠরে জন্ম'। পশুদেরও এইভাবে জন্ম হয়। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা অনুসারে, শৌক্র জন্ম থেকে সংস্কার সম্ভব। জন্মের পূর্বে, অর্থাৎ পিতামাতার সঙ্গমের পূর্বে, গর্ভাধান সংস্কার বলে একটি সংস্কার রয়েছে, সেটি পালন করা অবশ্য কর্তব্য। এই সংস্কারটি উচ্চতর বর্ণের জন্য, বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের জন্য। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, যদি উচ্চতর বর্ণের পিতামাতা গর্ভাধান সংস্কার না করে, তাহলে সমগ্র বংশ শূদ্র হয়ে যায়। এও বলা হয়েছে যে, গর্ভাধান সংস্কারের অভাবে কলিযুগে সকলেই শূদ্র। এটিই হচ্ছে বৈদিক পদ্ধতি। কিন্তু গর্ভাধান সংস্কারের অভাবে শূদ্র হওয়া সত্ত্বেও, পাঞ্চরাত্রিক বিধি অনুসারে কারও যদি কৃষ্ণভক্ত হওয়ার একটুও প্রবৃত্তি থাকে তা হলে তাকে ভগবদ্ভক্তির চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত। শ্রীল সনাতন গোস্বামীর উপদেশ অনুসারে, আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন পাঞ্চরাত্রিক বিধি অবলম্বন করেছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামী বলেছেন—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥

"কাঁসা যেমন পারদের মিশ্রণে স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, তেমনই সোনার মতো শুদ্ধ না হলেও, কেবল দীক্ষা-বিধানের দ্বারা মানুষ ব্রাহ্মণত্ব বা দ্বিজত্ব লাভ করতে পারে।" (*হরিভক্তিবিলাস* ২/১২) কেউ যদি এইভাবে উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দীক্ষিত হন, তাহলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ দ্বিজ বলে স্বীকার করা যেতে পারে। আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে, আমরা তাই শিষ্যদের প্রথমে দীক্ষা দিয়ে হরেকৃষ্ণ

মহামন্ত্র জপ করার যোগ্যতা প্রদান করি। নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার ফলে এবং বিধিনিষেধগুলি অনুসরণ করার ফলে, সে ব্রাহ্মণ দীক্ষা লাভের যোগ্য হয়। কারণ যোগ্য ব্রাহ্মণ না হওয়া পর্যন্ত, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর পূজা করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না। এটিকে বলা হয় *যাজ্ঞিক-জন্ম* । আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘে দুবার দীক্ষালাভ না করা পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা এবং দ্বিতীয়বার গায়ত্রীমন্ত্র লাভ না করা পর্যন্ত তাকে রন্ধনশালায় অথবা পূজার ঘরে সেবা করার অনুমতি দেওয়া হয় না। কিন্তু কেউ যখন শ্রীবিগ্রহের পূজা করার স্তরে উন্নীত হন, তখন তাঁর পূর্বজন্মের কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ ।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ ॥

"চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন, তাহলে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণে পরিণত হন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি ভক্তিহীন হয়, তাহলে সে চণ্ডালেরও অধম।" যদি কেউ ভগবদ্ভক্তিতে উন্নত হন, তা হলে চণ্ডালকুলে তাঁর জন্ম হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। তিনি তখন পবিত্র হয়ে যান। এই সম্বন্ধে শ্রী প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

বিপ্রাদ্ দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৯/১০)

কেউ যদি ব্রাহ্মণোচিত সমস্ত গুণে গুণান্বিত ব্রাহ্মণ হন অথচ ভগবানের পূজায় বিমুখ হন, তা হলে তাঁকে অধঃপতিত বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু কেউ যদি ভগবানের সেবার প্রতি আসক্ত হন, তা হলে তিনি চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত হলেও মহিমামণ্ডিত হন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রকার চণ্ডাল কেবল নিজেকেই নন, তাঁর পূর্ব-পুরুষদেরও উদ্ধার করতে পারেন। অথচ ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত দাম্ভিক ব্রাহ্মণ পর্যন্ত নিজেকে উদ্ধার করতে পারে না, তার পরিবারের আর কি কথা! শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ বা অব্রাহ্মণ হওয়ার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এমন কি অন্ত্যজেরও আট বছর অতিক্রান্ত হলে, দীক্ষা-বিধানের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তাই নারদ মুনি বলেছেন—

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তৎ তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)

ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হলেই যে আপনা থেকেই ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় তা নয়। সে অবশ্যই ব্রাহ্মণ হওয়ার একটি সুন্দর সুযোগ পায়, কিন্তু ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন না করা পর্যন্ত, তাকে ব্রাহ্মণ বলে গ্রহণ করা যায় না। পক্ষান্তরে, যদি শূদ্রের মধ্যেও ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি দেখা যায়, তা হলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করা উচিত। তার বহু প্রমাণ *শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, ভরদ্বাজ-সংহিতা, পঞ্চরাত্র* এবং অন্যান্য বহু শাস্ত্রে রয়েছে।

দেবতাদের আয়ুর বিষয়ে, বিশেষ করে ব্রহ্মার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

সহস্রযুগ পর্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥

(*শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* ৮/১৭)

ব্রহ্মার এক দিন এক সহস্র চতুর্যুগের (৪৩,২০,০০০ বৎসর) সমান। ব্রহ্মার রাত্রির দৈর্ঘ্যও সেই পরিমাণ। ব্রহ্মার আয়ু এই দিনরাত্রির আয়তন অনুসারে একশত বৎসর। *বিবুধায়ুষা* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, এত দীর্ঘ আয়ু সত্ত্বেও মানুষ যদি ভগবদ্ভক্ত না হয়, তা হলে তার জীবন ব্যর্থ। জীব হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্যদাস, এবং ভগবদ্ভক্তির স্তরে না আসা পর্যন্ত তার আয়ু, উচ্চকুলে জন্ম, মহিমান্বিত কার্যকলাপ এবং অন্য সবকিছুই চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১১

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥ ১১ ॥

শ্রুতেন—বেদ অধ্যয়ন দ্বারা; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি লাভ; **বচোভিঃ**—বাণীর দ্বারা; **চিত্ত**—চেতনার; **বৃত্তিভিঃ**—বৃত্তির দ্বারা; **বুদ্ধ্যা**—বুদ্ধির দ্বারা; **বা**—অথবা; **কিম্**—কি লাভ; **নিপুণয়া**—নৈপুণ্যের দ্বারা; **বলেন**—দৈহিক শক্তির দ্বারা; **ইন্দ্রিয়-রাধসা**—ইন্দ্রিয়-পটুতার দ্বারা।

অনুবাদ

ভগবদ্ভক্তি ব্যতীত কঠোর তপস্যা, বেদ-শ্রবণ, শাস্ত্র-ব্যাখ্যাদি, বাক্-বিলাস, মনোধর্মী জ্ঞান, উন্নত বুদ্ধিমত্তা, বল এবং ইন্দ্রিয়-পটুতার কি ফল?

তাৎপর্য

উপনিষদ থেকে (*মুণ্ডক উপনিষদ* ৩/২/৩) আমরা জানতে পারি—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন ।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

কেবল *বেদ* অধ্যয়নের দ্বারা ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের উন্নতিসাধন কখনই হয় না। বহু মায়াবাদী সন্ন্যাসী রয়েছে, যারা *বেদ, বেদান্ত-সূত্র* এবং *উপনিষদ* অধ্যয়নে রত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা সেই জ্ঞানের সারমর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। অর্থাৎ তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানে না। *বেদের* সারাতিসার শ্রীকৃষ্ণকে যদি তারা না জানতে পারে, তা হলে সেই *বেদ* অধ্যয়নে কি লাভ? *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান প্রতিপন্ন করেছেন, *বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ*—"সমস্ত বেদের দ্বারা আমি জ্ঞাতব্য।"

এমন অনেক ধর্মীয় পদ্ধতি রয়েছে, যেখানে তপস্যার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু চরমে তারা কেউই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানে না। তাই এই প্রকার তপস্যার ফলে কোন লাভ হয় না। কেউ যদি সত্যি-সত্যি ভগবানের কাছে পৌঁছাতে পারে, তা হলে তার আর কঠোর তপস্যা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। *ভগবদ্গীতার* নবম অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তিকে *রাজগুহ্যম্,* সমস্ত গোপনীয় জ্ঞানের রাজা বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের অনেক উত্তম পাঠক রয়েছে, যারা খুব সুন্দর ঢঙে *রামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত* এবং *ভগবদ্গীতা* পাঠ করতে পারে। কখনও কখনও এই সমস্ত পেশাদারি পাঠকেরা অনেক পাণ্ডিত্য এবং বাক্‌পটুতা প্রদর্শন করে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তারা ভগবানের ভক্ত নয়। তাই তারা শ্রোতাদের কাছে সেই জ্ঞানের সারাতিসার শ্রীকৃষ্ণকে তুলে ধরতে পারে না। বহু চিন্তাশীল লেখক এবং সৃজনশীল দার্শনিক রয়েছে, কিন্তু তাদের সমস্ত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যদি তারা ভগবানের সমীপবর্তী না হতে পারে, তা হলে তা কেবল অনর্থক ভ্রান্তিবিলাস। এই জড় জগতে বহু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ রয়েছে, এবং তারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য কত কিছু আবিষ্কার করে। তারা সমস্ত জড় উপাদানের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণও করে, কিন্তু তাদের এত জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও এবং জড় জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে নৈপুণ্য থাকা সত্ত্বেও, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন, কারণ তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গুলি সম্বন্ধেও বলা যায় যে, বহু পশু-পক্ষী রয়েছে, যারা তাদের ইন্দ্রিয়গুলির ব্যবহারে মানুষদের থেকেও অনেক বেশি দক্ষ। যেমন, শকুন অথবা বাজপাখি আকাশের অনেক উঁচুতে উড়ে গিয়েও মাটিতে একটি ছোট্ট বস্তুকে অতি স্পষ্টরূপে দেখতে পায়। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিশক্তি এতই প্রখর যে, বহু দূর থেকেও তারা তাদের আহার্য মৃতদেহ দেখতে পায়। তাদের দৃষ্টিশক্তি অবশ্যই মানুষদের থেকে অনেক বেশি প্রখর, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তাদের অস্তিত্ব মানুষের থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তেমনই কুকুরেরা বহু দূর থেকে বস্তুর ঘ্রাণ গ্রহণ করতে পারে। মাছেরা শব্দের দ্বারা বুঝতে পারে যে শত্রু আসছে। এই সমস্ত দৃষ্টান্ত *শ্রীমদ্ভাগবতে* বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি যদি জীবনের পরম সিদ্ধিলাভে অর্থাৎ ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য না করে, তাহলে সেগুলি অর্থহীন।

শ্লোক ১২

কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥ ১২ ॥

কিম্—কি লাভ; **বা**—অথবা; **যোগেন**—যোগ অভ্যাসের দ্বারা; **সাংখ্যেন**—সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়নের দ্বারা; **ন্যাস**—সন্ন্যাস গ্রহণের দ্বারা; **স্বাধ্যায়য়োঃ**—বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা; **অপি**—ও; **কিম্**—কি লাভ; **বা**—অথবা; **শ্রেয়োভিঃ**—শুভ কর্মের দ্বারা; **অন্যৈঃ**—অন্য; **চ**—এবং; **ন**—কখনই না; **যত্র**—যেখানে; **আত্ম-প্রদঃ**—আত্মার পূর্ণ তৃপ্তি; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

যে আধ্যাত্মিক অনুশীলন চরমে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে না, তা সে যোগ অভ্যাস হোক, সাংখ্য-দর্শন অধ্যয়ন হোক, কঠোর তপস্যা হোক, সন্ন্যাস গ্রহণ হোক অথবা বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন হোক, তা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। এগুলি আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হতে পারে, কিন্তু যদি তা ভগবান শ্রীহরিকে জানতে সাহায্য না করে, তা হলে সেগুলি সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন।

তাৎপর্য

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (*মধ্য* ২৪/১০৯) বলা হয়েছে—

ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানে 'মুক্তি' নাহি হয় ।
ভক্তি সাধন করে যেই 'প্রাপ্ত-ব্রহ্মলয়' ॥

নির্বিশেষবাদীরা ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন না করে, সাংখ্য, বৈশেষিক, যোগ ইত্যাদির পন্থা অবলম্বন করে। এগুলির উপযোগিতা কেবল ভগবদ্ভক্তি লাভের সহায়করূপে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই সনাতন গোস্বামীকে বলেছেন যে, ভক্তি বিনা জ্ঞান, যোগ, সাংখ্য-দর্শন ইত্যাদি কোন ফল প্রদান করতে পারে না। নির্বিশেষবাদীরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে চায়, কিন্তু ভক্তি বিনা ব্রহ্মে লীন হওয়াও সম্ভব নয়। পরমতত্ত্বকে তিনভাবে উপলব্ধি করা যায়—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। এই সব কটি উপলব্ধিতেই ভক্তির প্রয়োজন। কখনও কখনও মায়াবাদীদেরও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে দেখা যায়, যদিও তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়া। যোগীরাও কখনও কখনও হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ভক্তদের থেকে ভিন্ন। কর্ম, জ্ঞান, যোগ ইত্যাদি সমস্ত পন্থাতেই ভক্তির প্রয়োজন। সেটিই এই শ্লোকের তাৎপর্য।

শ্লোক ১৩

শ্রেয়সামপি সর্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ ।
সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রেয়সাম্—মঙ্গলজনক কার্যকলাপের; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **সর্বেষাম্**—সমস্ত; **আত্মা**—আত্মা; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অবধিঃ**—পরাকাষ্ঠা; **অর্থতঃ**—বস্তুত; **সর্বেষাম্**—সবকিছুর; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানাম্**—জীবদের; **হরিঃ**—ভগবান; **আত্মা**—পরমাত্মা; **আত্ম-দঃ**—যিনি আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করতে পারেন; **প্রিয়ঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে ভগবানই সমস্ত আত্ম-উপলব্ধির মূল উৎস। তাই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ইত্যাদি সমস্ত শুভ কার্যের চরম লক্ষ্য হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি, এবং জড় জগৎ তাঁর বহিরঙ্গা শক্তি। অতএব সকলেরই হৃদয়ঙ্গম করা কর্তব্য যে, পরমেশ্বর ভগবানই হচ্ছেন জড় এবং চেতন

উভয়েরই মূল উৎস। সেই কথা *ভগবদ্গীতার* সপ্তম অধ্যায়ে (৭/৪-৫) বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্ব দিয়ে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে। হে অর্জুন! এই অপরা প্রকৃতির অতীত আমার একটি পরা প্রকৃতি রয়েছে। সমস্ত জীবেরা সেই পরা প্রকৃতিসম্ভূত, এবং তারা এই জড় জগতে সংগ্রাম করছে এবং এই জগৎকে ধারণ করে আছে।"

সমগ্র জড় সৃষ্টি জড় এবং চেতনের সমন্বয়। চেতন অংশটি হচ্ছে জীব, এবং এই সমস্ত জীবদের এখানে প্রকৃতি বা শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জীবকে কখনই *পুরুষ* অর্থাৎ পরম পুরুষ বলে বর্ণনা করা হয়নি; তাই জীবকে ভগবান বলে মনে করা হচ্ছে অবিদ্যা। যদিও শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন ভেদ নেই, তবুও জীব হচ্ছে ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবের কর্তব্য হচ্ছে তার প্রকৃত পরিচয় অবগত হওয়া। সে যখন তা করে, তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভগবদ্ভক্তির স্তরে আসার সমস্ত সুযোগ প্রদান করেন। সেই স্তরে উন্নীত হওয়াই জীবনের সার্থকতা। বৈদিক *উপনিষদে* তা ইঙ্গিত করা হয়েছে—

যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়ও* (১০/১০) প্রতিপন্ন করেছেন—

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥

"যারা নিরন্তর আমার ভক্তি করে এবং প্রীতিপূর্বক আমার আরাধনা করে, আমি তাদের বুদ্ধিযোগ প্রদান করি, যার ফলে তারা আমার কাছে ফিরে আসতে পারে।" মূল কথা হচ্ছে যে, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অথবা অষ্টাঙ্গযোগ দিয়ে শুরু করলেও, চরমে মানুষকে ভক্তিযোগের স্তরে আসতেই হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ ভক্তিযোগের স্তরে না আসে, ততক্ষণ আত্ম-উপলব্ধি বা পরমতত্ত্ব উপলব্ধি সম্ভব নয়।

শ্লোক ১৪

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥ ১৪ ॥

যথা—যেমন; **তরোঃ**—বৃক্ষের; **মূল**—মূল; **নিষেচনেন**—জল সিঞ্চনের দ্বারা; **তৃপ্যন্তি**—তৃপ্ত হয়; **তৎ**—তার; **স্কন্ধ**—কাণ্ড; **ভুজ**—শাখা; **উপশাখাঃ**—উপশাখা; **প্রাণ**—প্রাণবায়ু; **উপহারাৎ**—আহার্যদ্রব্য প্রদানের দ্বারা; **চ**—এবং; **যথা**—যেমন; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **তথা এব**—তেমনই; **সর্ব**—সমস্ত দেবতাদের; **অর্হণম্**—পূজা; **অচ্যুত**—পরমেশ্বর ভগবানের; **ইজ্যা**—পূজা।

অনুবাদ

বৃক্ষের মূলদেশে জল সিঞ্চন করা হলে তার স্কন্ধ, শাখা ইত্যাদি সঞ্জীবিত হয়, এবং উদরে আহার্যদ্রব্য প্রদান করলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সাধন হয়, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানের আরাধনা করা হলে, ভগবানেরই বিভিন্ন অংশ দেবতারাও আপনা থেকেই তৃপ্ত হন।

তাৎপর্য

কখনও কখনও মানুষ প্রশ্ন করে, কেন এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন দেব-দেবীদের পূজা না করে, কেবল শ্রীকৃষ্ণেরই পূজা করার কথা বলে। তার উত্তর এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১) বলা হয়েছে, *ঊর্ধ্বমূলমধঃশাখম্*—এই জড় জগৎ নীচের দিকে বিস্তৃত, এবং তাঁর মূল হচ্ছেন ভগবান। যে-কথা ভগবান *ভগবদ্গীতায়* (১০/৮) প্রতিপন্ন করেছেন—অহং *সর্বস্য প্রভবঃ*—"আমি সমগ্র চিৎ-জগৎ এবং জড় জগতের উৎস।" শ্রীকৃষ্ণই সবকিছুর উৎস; তাই তাঁর সেবা করা হলে আপনা থেকেই সমস্ত দেবদেবীর সেবা হয়ে যায়। কখনও কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, কর্ম ও জ্ঞানের সার্থক সম্পাদনের জন্য ভক্তির মিশ্রণের প্রয়োজন, এবং কখনও তর্ক উত্থাপন করা হয় যে, ভক্তির সার্থক সম্পাদনের জন্য কর্ম ও জ্ঞানের প্রয়োজন। আসল কথা হচ্ছে যে, ভক্তি ব্যতীত যদিও কর্ম এবং জ্ঞান সফল হয় না, কিন্তু ভক্তি, কর্ম এবং জ্ঞানের অপেক্ষা করে না। প্রকৃতপক্ষে শ্রীল রূপ

গোস্বামীর বর্ণনা অনুসারে, *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*—শুদ্ধ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের দ্বারা কলুষিত হওয়া উচিত নয়। আধুনিক সমাজ নানা প্রকার জনকল্যাণকর কার্য, মানবতাবাদী কার্য ইত্যাদিতে ব্যস্ত; কিন্তু মানুষ জানে না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই সমস্ত কার্য সম্পাদিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেগুলি কখনই সফল হবে না। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা না করে তাঁরই শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ দেব-দেবীদের পূজা করলে ক্ষতি কি, এবং তার উত্তরও এই শ্লোকে দেওয়া হয়েছে। উদরকে খাদ্য দেওয়া হলে, ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই তৃপ্ত হয়। কেউ যদি স্বতন্ত্রভাবে তার চক্ষু অথবা কর্ণকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে, তা হলে কেবল বিড়ম্বনারই সৃষ্টি হবে। কেবল উদরকে আহার্যদ্রব্য প্রদান করে আমরা সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করি। ইন্দ্রিয়গুলিকে আলাদাভাবে সেবা করার প্রয়োজন হয় না অথবা তা সম্ভবও নয়। মূল কথা হচ্ছে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার দ্বারা সবকিছুই সম্পূর্ণ হয়। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ২২/৬২) বলা হয়েছে—*কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়* ॥

শ্লোক ১৫

যথৈব সূর্যাৎ প্রভবন্তি বারঃ
পুনশ্চ তস্মিন্ প্রবিশন্তি কালে ।
ভূতানি ভূমৌ স্থিরজঙ্গমানি
তথা হরাবেব গুণপ্রবাহঃ ॥ ১৫ ॥

যথা—যেমন; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **সূর্যাৎ**—সূর্য থেকে; **প্রভবন্তি**—উৎপন্ন হয়; **বারঃ**—জল; **পুনঃ**—পুনরায়; **চ**—এবং; **তস্মিন্**—তাতে; **প্রবিশন্তি**—প্রবেশ করে; **কালে**—যথাসময়; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **ভূমৌ**—পৃথিবীতে; **স্থির**—স্থাবর; **জঙ্গমানি**—এবং জঙ্গম; **তথা**—তেমনই; **হরৌ**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **গুণ-প্রবাহঃ**—জড়া প্রকৃতির উদ্ভব।

অনুবাদ

বর্ষার জলের উদ্ভব হয় সূর্য থেকে, কালক্রমে গ্রীষ্মকালে সূর্যই আবার জল শোষণ করে নেয়। তেমনই, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত জীব পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং কিছুকাল পর তারা পুনরায় পৃথিবীর ধূলিতেই মিশে যাবে।

তেমনই, সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং কালক্রমে সবই আবার ভগবানে লীন হয়ে যাবে।

তাৎপর্য

জ্ঞানের অভাবেই নির্বিশেষবাদীরা বুঝতে পারে না, কি করে সবকিছু ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়ে আবার তাঁর মধ্যেই লীন হয়ে যায়। সেই কথা প্রতিপন্ন করে *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪০) বলা হয়েছে—

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি-
কোটিষ্বশেষবসুধাদিবিভূতিভিন্নম্ ।
তদ্ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

ব্রহ্মজ্যোতি শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে নির্গত হয়, এবং সেই ব্রহ্মজ্যোতিতে সবকিছু বিরাজ করছে। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—*মৎস্থানি সর্বভূতানি* । যদিও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সর্বত্র উপস্থিত নন, তবুও তাঁর শক্তি সমস্ত সৃষ্টির কারণ। সমগ্র জড় জগৎ শ্রীকৃষ্ণেরই শক্তির প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই শ্লোকে দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি পৃথিবীর বনস্পতিকে সজীব করে, মানুষ এবং পশুদের জীবনীশক্তি লাভের সহায়ক হয়। যখন বৃষ্টি হয় না, তখন খাদ্যাভাবে মানুষ এবং পশু মরে যায়। সমস্ত বনস্পতি, স্থাবর ও জঙ্গম—সবই মূলত পৃথিবী থেকে উদ্ভূত হয়েছে। তারা পৃথিবী থেকে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় পৃথিবীতেই লীন হয়ে যায়। তেমনই, মহত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের দেহ থেকে উদ্ভূত হয়েছে, এবং প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থায় সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করে নেন, তখন সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৮) সেই কথা ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—

যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলোজা জগদণ্ডনাথাঃ ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

এই জড় সৃষ্টি ভগবানের দেহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, এবং প্রলয়ের সময় তা পুনরায় তাঁরই দেহে লীন হয়ে যায়। এই সৃষ্টি এবং প্রলয়ের পন্থা সম্ভব হয় মহাবিষ্ণুর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণের একটি অংশ মাত্র।

শ্লোক ১৬

এতৎপদং তজ্জগদাত্মনঃ পরং
সকৃদ্বিভাতং সবিতুর্যথা প্রভা ।
যথাসবো জাগ্রতি সুপ্তশক্তয়ো
দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎ—এই জগৎ; **পদম্**—নিবাসস্থান; **তৎ**—তা; **জগৎ-আত্মনঃ**—ভগবানের; **পরম্**—দিব্য; **সকৃৎ**—কখনও কখনও; **বিভাতম্**—প্রকাশিত; **সবিতুঃ**—সূর্যের; **যথা**—যেমন; **প্রভা**—কিরণ; **যথা**—যেমন; **অসবঃ**—ইন্দ্রিয়গুলি; **জাগ্রতি**—প্রকাশিত হয়; **সুপ্ত**—নিষ্ক্রিয়; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **দ্রব্য**—ভৌতিক উপাদান; **ক্রিয়া**—কার্যকলাপ; **জ্ঞান**—জ্ঞান; **ভিদা-ভ্রম**—ভ্রম থেকে উৎপন্ন ভেদ; **অত্যয়ঃ**—দূর হয়।

অনুবাদ

সূর্যকিরণ যেমন সূর্য থেকে অভিন্ন, এই জগৎও তেমন পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। তাই ভগবান এই জড় জগতে সর্বব্যাপ্ত। ইন্দ্রিয়গুলি যখন সক্রিয় থাকে, তখন সেইগুলিকে দেহের বিভিন্ন অংশ বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তাদের কার্যকলাপ প্রকট হয় না। তেমনই সারা জগৎ ভগবান থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হলেও তা ভিন্ন নয়।

তাৎপর্য

এই দৃষ্টান্তগুলি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বকে* প্রতিপন্ন করে। ভগবান এই জগৎ থেকে যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন। পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ভগবান একটি গাছের মূলের মতো সবকিছুর পরম কারণ। ভগবান যে কিভাবে সর্বব্যাপ্ত তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি এই জড় জগতে সবকিছুর মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। যেহেতু ভগবানের শক্তি ভগবান থেকে অভিন্ন, তাই এই জগৎও আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন বলে মনে হলেও তাঁর থেকে অভিন্ন। সূর্যকিরণ সূর্য থেকে ভিন্ন নয়, কিন্তু যুগপৎ তা ভিন্ন। কেউ সূর্যের আলোকে থাকতে পারে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সূর্যে রয়েছে। যারা এই জড় জগতে বাস করে, তারা ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটায় বাস করে, কিন্তু বদ্ধ অবস্থায় তারা প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারে না।

এই শ্লোকে *পদম্* শব্দটি ভগবানের নিবাসস্থানকে ইঙ্গিত করে। *ঈশোপনিষদে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্* । একটি বাড়ির মালিক বাড়ির একটি ঘরে

থাকতে পারে, কিন্তু সারা বাড়িটি তারই সম্পত্তি। রাজা তাঁর প্রাসাদের একটি কক্ষে থাকতে পারেন, কিন্তু সারা প্রাসাদটি তাঁর সম্পত্তি। এমন নয় যে, রাজাকে তাঁর মালিকানা জাহির করার জন্য প্রাসাদের প্রত্যেকটি ঘরে থাকতে হবে। সেই ঘরগুলি থেকে অনুপস্থিত থাকলেও সারা প্রাসাদটি তাঁর সম্পত্তি।

সূর্যকিরণ আলোকময়, সূর্যমণ্ডল আলোকময় এবং সূর্যদেবও আলোকময়। কিন্তু সূর্যকিরণ এবং সূর্যদেব বিবস্বান এক নয়। এটিই *অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বের* অর্থ। সমস্ত গ্রহগুলি সূর্যকিরণে রয়েছে, এবং সূর্যের শক্তির প্রভাবে তারা তাদের কক্ষপথে আবর্তিত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রহে, সূর্যকিরণের প্রভাবে গাছপালাগুলি বর্ধিত হচ্ছে এবং তাদের রং পরিবর্তন হচ্ছে। সূর্য থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে, সূর্যকিরণ সূর্য থেকে অভিন্ন। তেমনই সূর্যকিরণে আশ্রিত সমস্ত গ্রহগুলিও সূর্য থেকে অভিন্ন। সারা জগৎ সূর্যের উপর পূর্ণরূপে নির্ভর করছে, কারণ তা সূর্য থেকে উৎপন্ন এবং কারণরূপে সূর্য তার কার্যের মধ্যে নিহিত। তেমনই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, এবং সমস্ত কার্য সেই মূল কারণ থেকে প্রকাশিত। সারা জগৎ ভগবানের শক্তির বিস্তার বলে বুঝতে হবে।

কেউ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন তার ইন্দ্রিয়গুলি নিষ্ক্রিয় থাকে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, ইন্দ্রিয়গুলি আর নেই। সে যখন জেগে ওঠে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি পুনরায় সক্রিয় হয়। তেমনই এই জগৎ কখনও ব্যক্ত এবং কখনও অব্যক্ত, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে (*ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে*)। যখন জড় জগতের প্রলয় হয়, তখন তা এক প্রকার নিদ্রিত অবস্থা বা নিষ্ক্রিয় অবস্থা। জড় জগৎ সক্রিয় হোক্ বা নিষ্ক্রিয় হোক, তা সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের শক্তি। তাই জড় জগতের ক্ষেত্রে 'প্রকট' এবং 'অপ্রকট' শব্দগুলির ব্যবহার হয়।

শ্লোক ১৭

যথা নভস্যভ্রতমঃপ্রকাশা
ভবন্তি ভূপা ন ভবন্ত্যনুক্রমাৎ ।
এবং পরে ব্রহ্মণি শক্তয়স্ত্বমূ
রজস্তমঃসত্ত্বমিতি প্রবাহঃ ॥ ১৭ ॥

যথা—যেমন; **নভসি**—আকাশে; **অভ্র**—মেঘ; **তমঃ**—অন্ধকার; **প্রকাশাঃ**—এবং আলোক; **ভবন্তি**—হয়; **ভূ-পাঃ**—হে রাজাগণ; **ন ভবন্তি**—আবির্ভূত হয় না;

অনুক্রমাৎ—পর্যায়ক্রমে; **এবম্**—এইভাবে; **পরে**—পরম; **ব্রহ্মণি**—ব্রহ্মে; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **তু**—তখন; **অমূঃ**—সেই সমস্ত; **রজঃ**—রজোগুণ; **তমঃ**—তমোগুণ; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **ইতি**—এইভাবে; **প্রবাহঃ**—প্রবাহ।

অনুবাদ

হে রাজাগণ! আকাশে যেমন কখনও মেঘ, কখনও অন্ধকার এবং কখনও বা আলোক পর্যায়ক্রমে হয়ে থাকে, তেমনই পরমব্রহ্মে রজ, তম ও সত্ত্বগুণ শক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। কখনও তাদের প্রকাশ হয় এবং কখনও তা লীন হয়ে থাকে।

তাৎপর্য

অন্ধকার, আলোক এবং মেঘ কখনও প্রকাশিত হয়, আবার কখনও অপ্রকট হয়, কিন্তু তারা অপ্রকট হলেও শক্তি সর্বদাই থাকে। আকাশে কখনও আমরা মেঘ দেখতে পাই, কখনও বৃষ্টি এবং কখনও তুষার। কখনও আমরা দেখি রাত্রি, কখনও দিন, কখনও আলোক এবং কখনও অন্ধকার। এই সবেরই অস্তিত্ব সূর্যের প্রভাবে, কিন্তু সূর্য এই সমস্ত পরিবর্তনের দ্বারা কখনও প্রভাবিত হয় না। তেমনই, ভগবান যদিও সমগ্র জগতের মূল কারণ, তবুও তিনি এই জড় জগতের দ্বারা প্রভাবিত হন না। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) প্রতিপন্ন হয়েছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"মাটি, জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই আটটি তত্ত্বের দ্বারা আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি রচিত হয়েছে।"

যদিও জড় উপাদানগুলি ভগবানের শক্তি, তবুও সেগুলি ভগবান থেকে ভিন্ন। ভগবান তাই জড়-জাগতিক অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত হন না। *বেদান্ত-সূত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে, *জন্মাদ্যস্য যতঃ*—এই জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় ভগবানেরই অস্তিত্বের ফলে সম্ভব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, জড় উপাদানের এই সমস্ত পরিবর্তনের দ্বারা ভগবান কখনও প্রভাবিত হন না। সেই কথাটি *প্রবাহ* শব্দটির দ্বারা সূচিত হয়েছে। সূর্য সর্বদাই উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত এবং তা কখনই মেঘ অথবা অন্ধকারের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানও সর্বদা তাঁর পরা প্রকৃতিতে বিরাজ করেন এবং তিনি কখনও জড় প্রবাহের দ্বারা প্রভাবিত হন না। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/১) সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যিনি গোবিন্দ নামে পরিচিত, তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। তাঁর দেহ সচ্চিদানন্দময়। তিনি সবকিছুর আদি উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই এবং তিনি সর্বকারণের পরম কারণ।" যদিও তিনি সর্বকারণের পরম কারণ, তবুও তিনি পরম, এবং তাঁর রূপ সচ্চিদানন্দময়। শ্রীকৃষ্ণ সবকিছুর আশ্রয় এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের অভিমত। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জড় জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জড়া প্রকৃতি হচ্ছে উপাদান কারণ। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে, প্রকৃতিকে সবকিছুর কারণ বলে মনে করা, ছাগলের গলার স্তনকে দুধের কারণ বলে মনে করার মতো। জড়া প্রকৃতি হচ্ছে জড় জগতের গৌণ কারণ, কিন্তু মূল কারণ হচ্ছেন নারায়ণ বা কৃষ্ণ। কখনও কখনও মানুষ মনে করে, মৃৎপাত্রের কারণ হচ্ছে মাটি। কুমোরের চাকায় মাটির পিণ্ড থেকে অনেক ঘট তৈরি হতে দেখা যায়, এবং যদিও নির্বোধ মানুষেরা মনে করতে পারে যে, চাকার উপরকার মাটি হচ্ছে ঘটের কারণ, কিন্তু যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানবান তাঁরা জানেন যে, তার মূল কারণ হচ্ছে কুমোর, যে মাটি সংগ্রহ করেছে এবং চাকা ঘোরাচ্ছে। জড়া প্রকৃতি এই জড় জগতের সৃষ্টির সহায়ক হতে পারে, কিন্তু তা পরম কারণ নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৯/১০) ভগবান তাই বলেছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।

"হে কৌন্তেয়! এই প্রকৃতি আমার নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে, এবং স্থাবর ও জঙ্গম জীবদের উৎপন্ন করছে।"

ভগবান জড়া প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, এবং তাঁর ঈক্ষণের প্রভাবে প্রকৃতির তিনগুণ ক্ষোভিত হয়। তখন সৃষ্টি হয়। মূল কথা হচ্ছে যে, জড়া প্রকৃতি জড় জগতের কারণ নয়। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।

শ্লোক ১৮

তেনৈকমাত্মানমশেষদেহিনাং
কালং প্রধানং পুরুষং পরেশম্ ।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহ-
মাত্মৈকভাবেন ভজধ্বমদ্ধা ॥ ১৮ ॥

তেন—অতএব; **একম্**—এক; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অশেষ**—অনন্ত; **দেহিনাম্**—জীবাত্মার; **কালম্**—কাল; **প্রধানম্**—উপাদান কারণ; **পুরুষম্**—পরম পুরুষ; **পরঈশম্**—পরমেশ্বর; **স্ব-তেজসা**—তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা; **ধ্বস্ত**—পৃথক; **গুণপ্রবাহম্**—জড় প্রবাহ থেকে; **আত্ম**—আত্মা; **এক-ভাবেন**—গুণগতভাবে এক বলে স্বীকার করে; **ভজধ্বম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হয়ে; **অদ্ধা**—প্রত্যক্ষভাবে।

অনুবাদ

যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ, তাই তিনি সমস্ত জীবের পরমাত্মা, এবং নিমিত্ত ও উপাদান কারণ। যেহেতু তিনি গুণ-প্রবাহরূপ সংসার থেকে পৃথক, তাই তিনি তাঁর মিথষ্ক্রিয়া থেকে মুক্ত এবং জড়া প্রকৃতির ঈশ্বর। অতএব তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে, গুণগতভাবে নিজেদের তাঁর সঙ্গে এক বলে মনে করে, তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া।

তাৎপর্য

বৈদিক বিচারে, সৃষ্টির তিনটি কারণ রয়েছে—কাল, উপাদান এবং স্রষ্টা। মিলিতভাবে তাদের বলা হয়, ত্রিতয়াত্মক বা ত্রিবিধ কারণ। এই তিনটি কারণ থেকে জড় জগতের সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত কারণগুলি ভগবানের মধ্যে পাওয়া যায়। *ব্রহ্মসংহিতায়* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—*সর্বকারণ-কারণম্* । নারদ মুনি তাই প্রচেতাদের উপদেশ দিয়েছেন, সেই পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন তার সমস্ত অংশগুলিও সঞ্জীবিত হয়, নারদ মুনির উপদেশ অনুসারে সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে, ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় সাক্ষাৎভাবে যুক্ত হওয়া। তার মধ্যে সমস্ত পুণ্যকর্ম নিহিত রয়েছে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* উল্লেখ করা হয়েছে—*কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্বকর্ম কৃত হয়* । এই শ্লোকে *স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহম্* পদটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও জড়া প্রকৃতির সমস্ত গুণগুলি ভগবানের চিন্ময় শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, তবুও তাদের দ্বারা ভগবান কখনও প্রভাবিত হন না। যাঁরা এই জ্ঞানে প্রকৃতই পারঙ্গত, তাঁরা সবকিছু ভগবানের সেবায় ব্যবহার করতে পারেন কারণ এই জড় জগতে কোন কিছুই ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

শ্লোক ১৯

দয়য়া সর্বভূতেষু সন্তুষ্ট্যা যেন কেন বা ।
সর্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জনার্দনঃ ॥ ১৯ ॥

দয়য়া—দয়া প্রদর্শন দ্বারা; **সর্ব-ভূতেষু**—সমস্ত জীবের প্রতি; **সন্তুষ্ট্যা**—সন্তুষ্ট হওয়ার দ্বারা; **যেন কেন বা**—কোন না কোন ভাবে; **সর্ব-ইন্দ্রিয়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়; **উপশান্ত্যা**—নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা; **চ**—ও; **তুষ্যতি**—সন্তুষ্ট হয়; **আশু**—অতি শীঘ্র; **জনার্দনঃ**—সমস্ত জীবের প্রভু।

অনুবাদ

সর্বভূতে দয়া, যথালাভে সন্তোষ এবং বিষয় থেকে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ—এই সবের দ্বারা ভগবান জনার্দন শীঘ্রই প্রসন্ন হন।

তাৎপর্য

এইগুলি হচ্ছে কয়েকটি উপায়, যার দ্বারা ভক্ত ভগবানকে প্রসন্ন করতে পারেন। এখানে সর্বপ্রথমে *দয়য়া সর্বভূতেষু* কথাটি উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত বদ্ধ জীবদের প্রতি দয়া প্রদর্শন। দয়া প্রদর্শনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে কৃষ্ণভক্তির প্রচার। এই জ্ঞানের অভাবে সারা জগৎ দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত। মানুষের জানা উচিত যে, পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সবকিছুরই মূল কারণ। সেই কথা জেনে, সকলেরই তাঁর সেবায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হওয়া উচিত। যাঁরা প্রকৃতই জ্ঞানবান, এবং পারমার্থিক উপলব্ধিতে উন্নত, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তির প্রচার করা, যাতে মানুষেরা এই পন্থা অবলম্বন করে তাদের জীবন সার্থক করতে পারে।

এখানে *সর্বভূতেষু* কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ তা বলতে কেবল মানুষকেই বোঝায় না, চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনির অন্তর্গত সব কটি প্রাণীকেও বোঝায়। ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব সমাজেরই কল্যাণ সাধন করেন না, তিনি সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধন করেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে, সকলেই পারমার্থিক সুফল লাভ করতে পারে। যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় শব্দতরঙ্গ ধ্বনিত হয়, তখন পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ, এমন কি গাছপালারাও লাভবান হয়। এইভাবে কেউ যখন উচ্চস্বরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন, তখন তিনি সমস্ত জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া প্রদর্শন করেন। সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন প্রসার করতে ভক্তদের সমস্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥

শুদ্ধ ভক্তকে যদি প্রচার করার জন্য নরকেও যেতে হয়, তাতে তার কিছু যায় আসে না। ভগবান যদিও বৈকুণ্ঠে রয়েছেন, তবু তিনি একটি শূকরের হৃদয়েও

রয়েছেন। নরকে প্রচার করার সময়েও শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের নিরন্তর সঙ্গ প্রভাবে শুদ্ধ ভক্তই থাকেন। এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য মানুষকে তার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে হয়। মন যখন ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকে, তখন ইন্দ্রিয়গুলি আপনা থেকেই সংযত হয়ে যায়।

শ্লোক ২০

অপহতসকলৈষণামলাত্ম-
ন্যবিরতমেধিতভাবনোপহূতঃ ।
নিজজনবশগত্বমাত্মনোঽয়-
ন্নসরতি ছিদ্রবদক্ষরঃ সতাং হি ॥ ২০ ॥

অপহত—নিরস্ত; **সকল**—সমস্ত; **এষণ**—বাসনা; **অমল**—নির্মল; **আত্মনি**—মনে; **অবিরতম্**—নিরন্তর; **এধিত**—বর্ধমান; **ভাবনা**—অনুভূতি-সহ; **উপহূতঃ**—আহূত হয়ে; **নিজ-জন**—তাঁর ভক্তদের; **বশ**—নিয়ন্ত্রণাধীন; **গত্বম্**—গিয়ে; **আত্মনঃ**—তাঁর; **অয়ন্**—জেনে; **ন**—কখনই না; **সরতি**—চলে যায়; **ছিদ্র-বৎ**—আকাশের মতো; **অক্ষরঃ**—ভগবান; **সতাম্**—ভক্তদের; **হি**—নিশ্চিতভাবে।

অনুবাদ

জড় বাসনার কলুষ থেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়ে, ভগবদ্ভক্ত সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। এইভাবে তাঁরা নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করতে পারেন এবং আন্তরিক অনুভূতি সহকারে তাঁকে সম্বোধন করতে পারেন। ভগবান তখন তাঁর ভক্তের বশীভূত হয়ে ক্ষণিকের জন্যও তাঁকে ত্যাগ করেন না, ঠিক যেমন আকাশ কখনও অদৃশ্য হয়ে যায় না।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোক থেকে স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, পরমেশ্বর ভগবান জনার্দন তাঁর ভক্তের কার্যকলাপে অতি শীঘ্র প্রসন্ন হন। শুদ্ধ ভক্ত সর্বদাই ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থাকেন। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে—*শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ* । নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করার ফলে, শুদ্ধ ভক্তের হৃদয় সব রকম বাসনা থেকে মুক্ত। জড় জগতে জীবের হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। জীব যখন নির্মল হয়, তখন আর সে কোন জড় বিষয়ের কথা চিন্তা করে না। মন যখন সম্পূর্ণরূপে নির্মল হয়, তখন যোগসিদ্ধি লাভ হয়, কারণ তখন যোগী তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে সর্বদা দর্শন

করেন (*ধ্যানাবস্থিত-তদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*)। ভগবান যখন ভক্তের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন, তখন ভক্ত আর জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা কলুষিত হতে পারেন না। জড়া প্রকৃতির গুণের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া মাত্রই, জীব বহু বাসনা করতে আরম্ভ করে এবং জড়সুখ ভোগের জন্য নানা রকম পরিকল্পনা করতে শুরু করে, কিন্তু হৃদয়ে ভগবানকে দর্শন করা মাত্রই, সমস্ত জড় বাসনা দূর হয়ে যায়। মন যখন সম্পূর্ণরূপে জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়, তখন ভক্ত নিরন্তর ভগবানের কথা চিন্তা করতে পারেন। এইভাবে তিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করেছেন—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

"হে নন্দনন্দন! আমি তোমার নিত্যদাস, কিন্তু জানি না কি কারণে আমি এই ভবসমুদ্রে পতিত হয়েছি। দয়া করে তুমি আমাকে উদ্ধার করে, তোমার শ্রীপাদপদ্মে ধূলিকণা-সদৃশ মনে করে স্থান দাও।" (*শিক্ষাষ্টক* ৫) তেমনই, শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন—

হা হা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানু-সুতাযুত,
করুণা করহ এইবার ।
নরোত্তম দাসে কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥

এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তের অধীন হন। ভগবান অজিত, কিন্তু তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তের দ্বারা পরাজিত হন। তিনি তাঁর ভক্তের অধীন হয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হন, ঠিক যেমন শ্রীকৃষ্ণ মা যশোদার কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে আনন্দ অনুভব করেছিলেন। নিজেকে ভক্তের অধীন বলে মনে করে ভগবান অত্যন্ত আনন্দিত হন। রাজা কখনও কখনও তাঁর সভায় বিদূষককে রাখেন, এবং পরিহাসছলে বিদূষক কখনও কখনও রাজাকে অপমান করে। কিন্তু রাজা তাতে ক্রুদ্ধ না হয়ে আনন্দিত হন। ভগবানকে সকলেই গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পূজা করে; তাই ভগবান কখনও কখনও তাঁর ভক্তের তিরস্কার উপভোগ করতে চান। এইভাবে ভগবানের সঙ্গে তাঁর ভক্তের সম্পর্ক নিত্য বিরাজমান, ঠিক মাথার উপরে আকাশের মতো।

শ্লোক ২১

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।
শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ॥ ২১ ॥

ন—কখনই না; **ভজতি**—গ্রহণ করেন; **কু-মনীষিণাম্**—কলুষিত হৃদয় ব্যক্তিদের; **সঃ**—তিনি; **ইজ্যাম্**—নৈবেদ্য; **হরিঃ**—ভগবান; **অধন**—নির্ধন; **আত্ম-ধন**—কেবলমাত্র ভগবানের উপর নির্ভরশীল; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **রসজ্ঞঃ**—রসগ্রাহী; **শ্রুত**—বিদ্যা; **ধন**—ঐশ্বর্য; **কুল**—আভিজাত্য; **কর্মণাম্**—এবং সকাম কর্মের; **মদৈঃ**—গর্বের ফলে; **যে**—যারা; **বিদধতি**—অনুষ্ঠান করে; **পাপম্**—অসম্মান; **অকিঞ্চনেষু**—দরিদ্র; **সৎসু**—ভক্তদের।

অনুবাদ

যাঁদের কাছে কোন ধন নেই, কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্তিরূপ সম্পদ লাভ করার ফলে সম্পূর্ণরূপে প্রসন্ন, সেই ভক্তরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। প্রকৃতপক্ষে, ভগবান এই প্রকার ভক্তের ভক্তি তৃপ্তিসহকারে আস্বাদন করেন। যারা পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য এবং কর্মের অহঙ্কারে মত্ত হয়ে কখনও কখনও ভক্তদের উপহাস করে, তারা যদি ভগবানের পূজাও করে, তবুও ভগবান কখনই সেই পূজা গ্রহণ করেন না।

তাৎপর্য

ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের উপর নির্ভরশীল। তিনি অভক্তদের নৈবেদ্য কখনও গ্রহণ করেন না। শুদ্ধ ভক্ত হচ্ছেন তিনি যিনি অনুভব করেন যে, তাঁর কাছে কোন জাগতিক সম্পদ নেই। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই ভক্তিরূপ ধন লাভ করার ফলে প্রসন্ন থাকেন। জাগতিক দৃষ্টিতে ভক্তদের কখনও কখনও দরিদ্র বলে মনে হয়, কিন্তু যেহেতু তাঁরা পারমার্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত উন্নত এবং ধনী, তাই তাঁরা ভগবানের সবচাইতে প্রিয়। এই-প্রকার ভক্তরা পরিবার, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদির প্রতি আসক্তি থেকে মুক্ত থাকেন। তাঁরা সবরকম জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করেন এবং ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়কেই তাঁদের একমাত্র সম্পদ বলে মনে করে সব সময় সুখী থাকেন। পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের স্থিতি বুঝতে পারেন। কেউ যদি শুদ্ধ ভক্তকে উপহাস করে, তাহলে ভগবানের দ্বারা

তিনি কখনও স্বীকৃত হন না। অর্থাৎ, শুদ্ধ ভক্তের চরণে যে অপরাধ করে, ভগবান কখনও তাঁকে ক্ষমা করেন না। ইতিহাসে তার বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। দুর্বাসা মুনি মহান ভক্ত অম্বরীষ মহারাজের চরণে অপরাধ করেছিলেন, এবং তার ফলে ভগবানের সুদর্শন চক্র দুর্বাসা মুনিকে দণ্ডদান করতে উদ্যত হয়েছিলেন। মহাযোগী দুর্বাসা ভগবানের কাছে পর্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁকে ক্ষমা করেননি। যাঁরা মুক্তির পথে রয়েছেন, তাঁদের সব সময় সাবধান থাকা উচিত যাতে শুদ্ধ ভক্তের চরণে অপরাধ না হয়ে যায়।

শ্লোক ২২

শ্রিয়মনুচরতীং তদর্থিনশ্চ
দ্বিপদপতীন্ বিবুধাংশ্চ যৎ স্বপূর্ণঃ ।
ন ভজতি নিজভৃত্যবর্গতন্ত্রঃ
কথমমুমুদ্বিসৃজেৎ পুমান্ কৃতজ্ঞঃ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ম্—লক্ষ্মীদেবী; **অনুচরতীম্**—অনুসরণকারিণী; **তৎ**—তাঁর; **অর্থিনঃ**—কৃপাকাঙ্ক্ষী; **চ**—এবং; **দ্বিপদ-পতীন্**—নৃপতি; **বিবুধান্**—দেবতাগণ; **চ**—ও; **যৎ**—যেহেতু; **স্ব-পূর্ণঃ**—স্বয়ংসম্পূর্ণ; **ন**—কখনই না; **ভজতি**—গ্রাহ্য করেন; **নিজ**—নিজের; **ভৃত্য-বর্গ**—তাঁর ভক্তদের; **তন্ত্রঃ**—নির্ভরশীল; **কথম্**—কিভাবে; **অমুম্**—তাঁকে; **উদ্বিসৃজেৎ**—ত্যাগ করতে পারেন; **পুমান্**—ব্যক্তি; **কৃতজ্ঞঃ**—কৃতজ্ঞ।

অনুবাদ

যদিও পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি লক্ষ্মীদেবীর, শ্রীকামী রাজা এবং দেবতাদেরও অনুবর্তন করেন না। এমন কোন্ ব্যক্তি রয়েছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও, সেই ভগবানের আরাধনা করবেন না?

তাৎপর্য

জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা, এমন কি বড় বড় রাজা-মহারাজা এবং স্বর্গের দেবতারাও লক্ষ্মীদেবীর পূজা করেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবী সর্বদাই ভগবানের সেবা করেন, যদিও ভগবানের তাঁর সেবার কোন প্রয়োজন নেই। *ব্রহ্মসংহিতায়* বলা হয়েছে যে, ভগবান শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেব্যমান, কিন্তু ভগবানের তাঁদের সেবার কোন প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি যদি চান তা হলে তিনি তাঁর হ্লাদিনী শক্তির দ্বারা

কোটি-কোটি লক্ষ্মীদেবীকে সৃষ্টি করতে পারেন। সেই ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপাবশত তাঁর ভক্তের বশীভূত হন। অতএব ভগবান যাঁকে এইভাবে কৃপা করেন, সেই ভক্ত কত ভাগ্যবান। কোন্ অকৃতজ্ঞ ভক্ত সেই ভগবানের পূজা করবে না এবং তাঁর প্রেমময়ী সেবা করবে না? প্রকৃতপক্ষে ভক্ত ক্ষণিকের জন্যও ভগবানের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা ভুলতে পারেন না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, ভগবান এবং তাঁর ভক্ত উভয়েই রসজ্ঞ। ভগবান এবং ভক্তের সম্পর্ককে কখনও জড় বলে মনে করা উচিত নয়। সেই সম্পর্ক সর্বদাই দিব্য। ভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ইত্যাদি আট প্রকার দিব্য ভাব রয়েছে। *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে সেগুলির আলোচনা করা হয়েছে। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং জীবের স্থিতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তারা ভগবান এবং ভক্তের পরস্পরের প্রতি আসক্তিকে জড়া প্রকৃতি সম্ভূত বলে মনে করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আসক্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক, এবং তাকে জড় বলে মনে করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৩

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি প্রচেতসো রাজন্নন্যাশ্চ ভগবৎকথাঃ ।
শ্রাবয়িত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ স্বায়ম্ভুবো মুনিঃ ॥ ২৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ উবাচ—মৈত্রেয় বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **প্রচেতসঃ**—প্রচেতাগণ; **রাজন্**—হে রাজন; **অন্যাঃ**—অন্যেরা; **চ**—ও; **ভগবৎ-কথাঃ**—ভগবান বিষয়ক কথা; **শ্রাবয়িত্বা**—উপদেশ দিয়ে; **ব্রহ্ম-লোকম্**—ব্রহ্মলোকে; **যযৌ**—ফিরে গিয়েছিলেন; **স্বায়ম্ভুবঃ**—ব্রহ্মার পুত্র; **মুনিঃ**—মহান ঋষি।

অনুবাদ

মহর্ষি মৈত্রেয় বললেন—হে মহারাজ বিদুর! ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি এইভাবে প্রচেতাদের ভগবান সম্বন্ধীয় কথা উপদেশ দিয়ে ব্রহ্মলোকে ফিরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের কথা শ্রবণ করতে হয়। প্রচেতারা নারদ মুনির কাছ থেকে সেই সুযোগটি পেয়েছিলেন, যিনি তাঁদের কাছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের কথা বর্ণনা করেছিলেন।

শ্লোক ২৪

তেঽপি তন্মুখনির্যাতং যশো লোকমলাপহম্ ।
হরের্নিশম্য তৎপাদং ধ্যায়ন্তস্তদ্‌গতিং যযুঃ ॥ ২৪ ॥

তে—প্রচেতাগণ; **অপি**—ও; **তৎ**—নারদের; **মুখ**—মুখ থেকে; **নির্যাতম্**—নির্গত; **যশঃ**—মহিমা; **লোক**—জগতের; **মল**—পাপ; **অপহম্**—বিনাশ করে; **হরেঃ**—ভগবান শ্রীহরির; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **তৎ**—ভগবানের; **পাদম্**—পা; **ধ্যায়ন্তঃ**—ধ্যান করে; **তৎ-গতিম্**—তাঁর ধামে; **যযুঃ**—গিয়েছিলেন।

অনুবাদ

নারদ মুনির শ্রীমুখ থেকে জগতের দুর্ভাগ্য বিনাশকারী ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, প্রচেতারাও ভগবানের প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করতে করতে, তাঁরা ভগবদ্ধামে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

এখানে দেখা গেছে যে, তত্ত্ববেত্তা ভক্তের কাছ থেকে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে, প্রচেতারা অনায়াসে ভগবানের প্রতি দৃঢ় আসক্তি লাভ করেছিলেন। তারপর, জীবনের অন্তিম সময়ে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করে, তাঁরা পরম ধাম বিষ্ণুলোকে গমন করেছিলেন। যাঁরা ভগবানের মহিমা নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে সেই পরম ধাম প্রাপ্ত হবেন। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৬৫) বলেছেন—

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥

"সর্বদা আমার কথা চিন্তা কর এবং আমার ভক্ত হও। আমার পূজা কর এবং আমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন কর। তা হলে তুমি নিশ্চিতভাবে আমার কাছে ফিরে আসবে। আমি তোমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, কারণ তুমি আমার অতি প্রিয় ভক্ত।"

শ্লোক ২৫

এতত্তেঽভিহিতং ক্ষত্তর্যন্মাং ত্বং পরিপৃষ্টবান্ ।
প্রচেতসাং নারদস্য সংবাদং হরিকীর্তনম্ ॥ ২৫ ॥

এতৎ—এই; **তে**—তোমাকে; **অভিহিতম্**—উপদেশ দেওয়া হয়েছে; **ক্ষত্তঃ**—হে বিদুর; **যৎ**—যা কিছু; **মাম্**—আমাকে; **ত্বম্**—তুমি; **পরিপৃষ্টবান্**—প্রশ্ন করেছ; **প্রচেতসাম্**—প্রচেতাদের; **নারদস্য**—নারদের; **সংবাদম্**—বার্তালাপ; **হরি-কীর্তনম্**—ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে।

অনুবাদ

হে বিদুর! ভগবানের মহিমা বর্ণনাকারী নারদ এবং প্রচেতাদের কথোপকথন সম্বন্ধে তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সেই সম্বন্ধে আমি সবকিছু তোমাকে বললাম। আমি যথাসাধ্য তা বর্ণনা করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। যেহেতু সমগ্র বিষয়টিই ভগবানের মহিমা বর্ণনা, তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভক্তের বর্ণনা আপনা থেকেই এসে যায়।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

য এষ উত্তানপদো মানবস্যানুবর্ণিতঃ ।
বংশঃ প্রিয়ব্রতস্যাপি নিবোধ নৃপসত্তম ॥ ২৬ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **যঃ**—যা; **এষঃ**—এই বংশ; **উত্তানপদঃ**—মহারাজ উত্তানপাদের; **মানবস্য**—স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র; **অনুবর্ণিতঃ**—পূর্বতন আচার্যদের পদাঙ্ক অনুসারে বর্ণিত; **বংশঃ**—বংশ; **প্রিয়ব্রতস্য**—রাজা প্রিয়ব্রতের; **অপি**—ও; **নিবোধ**—বুঝতে চেষ্টা করুন; **নৃপ-সত্তম**—হে রাজশ্রেষ্ঠ।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে নৃপশ্রেষ্ঠ (মহারাজ পরীক্ষিৎ)! আমি স্বায়ম্ভুব মনুর প্রথম পুত্র উত্তানপাদের বংশ বর্ণনা করলাম। এখন আমি স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধরদের কার্যকলাপ বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। দয়া করে মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন।

তাৎপর্য

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজা উত্তানপাদের পুত্র। ধ্রুব মহারাজ এবং রাজা উত্তানপাদের বংশধরদের কার্যকলাপ প্রচেতাগণ পর্যন্ত বর্ণিত হল। এখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী স্বায়ম্ভুব মনুর দ্বিতীয় পুত্র প্রিয়ব্রতের বংশধরদের বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ২৭

যো নারদাদাত্মবিদ্যামধিগম্য পুনর্মহীম্ ।
ভুক্ত্বা বিভজ্য পুত্রেভ্য ঐশ্বরং সমগাৎপদম্ ॥ ২৭ ॥

যঃ—যিনি; **নারদাৎ**—নারদ মুনির কাছ থেকে; **আত্ম-বিদ্যাম্**—আধ্যাত্মিক জ্ঞান; **অধিগম্য**—শিক্ষা লাভ করার পর; **পুনঃ**—পুনরায়; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **ভুক্ত্বা**—ভোগ করার পর; **বিভজ্য**—ভাগ করে; **পুত্রেভ্যঃ**—তাঁর পুত্রদের; **ঐশ্বরম্**—দিব্য; **সমগাৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **পদম্**—পদ।

অনুবাদ

মহারাজ প্রিয়ব্রত যদিও নারদ মুনির কাছ থেকে আত্মবিদ্যা লাভ করেছিলেন, তবুও তিনি পৃথিবীর শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ণরূপে জড়সুখ ভোগ করার পর, তিনি তাঁর পুত্রদের মধ্যে রাজ্য বিভাগ করে ভগবদ্ধামে ফিরে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৮

ইমাং তু কৌষারবিণোপবর্ণিতাং
ক্ষত্তা নিশম্যাজিতবাদসৎকথাম্ ।
প্রবৃদ্ধভাবোঽশ্রুকলাকুলো মুনে-
র্দধার মূর্ধ্না চরণং হৃদা হরেঃ ॥ ২৮ ॥

ইমাম্—এই সব; **তু**—তখন; **কৌষারবিণা**—মৈত্রেয়ের দ্বারা; **উপবর্ণিতাম্**—বর্ণিত; **ক্ষত্তা**—বিদুর; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অজিতবাদ**—ভগবানের মহিমা; **সৎ-কথাম্**—দিব্য বাণী; **প্রবৃদ্ধ**—উন্নত; **ভাবঃ**—প্রেম; **অশ্রু**—অশ্রু; **কলা**—বিন্দু; **আকুলঃ**—ব্যাকুল; **মুনেঃ**—মহর্ষির; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **মূর্ধ্না**—তাঁর মস্তকের দ্বারা; **চরণম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **হৃদা**—হৃদয়ের দ্বারা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

হে রাজন্! এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়ের কাছে ভগবান এবং তাঁর ভক্তের চিন্ময় আখ্যান শ্রবণ করে বিদুর আনন্দে বিহ্বল হয়েছিলেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে তিনি তখন তাঁর গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবানকে ধারণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

এটিই হচ্ছে মহাভাগবতের সঙ্গের প্রভাব। ভক্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের কাছ থেকে উপদেশ প্রাপ্ত হন এবং তার ফলে ভগবৎ প্রেমানন্দে বিহ্বল হন। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন—

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/৫/৩২)

মহাভাগবতের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ ব্যতীত শুদ্ধ ভক্ত হওয়া যায় না। এই জগতে যাঁর কোন কিছু করণীয় নেই, তাঁকে বলা হয় নিষ্কিঞ্চন। আত্ম-উপলব্ধি এবং ভগবদ্ধামে যাওয়ার পন্থা হচ্ছে সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের রেণু মস্তকে ধারণ করা। তার ফলে চিন্ময় উপলব্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়। মৈত্রেয়ের সঙ্গে বিদুরের সেই সম্পর্ক ছিল, এবং তার ফলে তিনি বাঞ্ছিত ফল লাভ করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

বিদুর উবাচ

সোঽয়মদ্য মহাযোগিন্ ভবতা করুণাত্মনা ।
দর্শিতস্তমসঃ পারো যত্রাকিঞ্চনগো হরিঃ ॥ ২৯ ॥

বিদুরঃ উবাচ—বিদুর বললেন; **সঃ**—সেই; **অয়ম্**—এই; **অদ্য**—অদ্য; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **করুণ-আত্মনা**—অত্যন্ত করুণাময়; **দর্শিতঃ**—আমাকে দেখানো হয়েছে; **তমসঃ**—অন্ধকারের; **পারঃ**—পরপার; **যত্র**—

যেখানে; **অকিঞ্চন-গঃ**—জড় কলুষ থেকে মুক্ত ব্যক্তিদেরই দ্বারা দর্শনযোগ্য; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

শ্রীবিদুর বললেন—হে পরম যোগী, হে শ্রেষ্ঠ ভক্ত! আপনার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে আমি এই তমসাচ্ছন্ন জগৎ থেকে মুক্তির পথ দর্শন করতে পেরেছি। এই পথ অনুসরণ করে, ভব-বন্ধনমুক্ত পুরুষ ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন।

তাৎপর্য

এই জড় জগৎকে বলা হয় *তমঃ*, এবং চিৎ-জগৎকে বলা হয় জ্যোতি। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকলেই যেন এই অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময় লোকে ফিরে যেতে চেষ্টা করে। সেই জ্যোতির্ময় লোকের কথা আত্ম-তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কৃপায় জানা যায়। সেই জন্য সমস্ত জড় বাসনা থেকেও মুক্ত হতে হয়। কেউ যখন জড় বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে মুক্ত পুরুষের সঙ্গ করেন, তখন তাঁর ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

শ্লোক ৩০

শ্রীশুক উবাচ

ইত্যানম্য তমামন্ত্র্য বিদুরো গজসাহ্বয়ম্ ।
স্বানাং দিদৃক্ষুঃ প্রযযৌ জ্ঞাতীনাং নির্বৃতাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **ইতি**—এইভাবে; **আনম্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **তম্**—মৈত্রেয়কে; **আমন্ত্র্য**—অনুমতি নিয়ে; **বিদুরঃ**—বিদুর; **গজ-সাহ্বয়ম্**—হস্তিনাপুর; **স্বানাম্**—স্বীয়; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **জ্ঞাতীনাম্**—তাঁর আত্মীয়দের; **নির্বৃত-আশয়ঃ**—জড় বাসনা থেকে মুক্ত।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—এইভাবে মহর্ষি মৈত্রেয়কে প্রণতি নিবেদন করে তাঁর অনুমতি নিয়ে, সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, বিদুর তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করার জন্য হস্তিনাপুরে গমন করেছিলেন।

তাৎপর্য

কোন মহাত্মা যখন তাঁর আত্মীয়দের দর্শন করতে যান, তখন কোন জড়-জাগতিক বাসনা নিয়ে তিনি তাদের দর্শন করেন না। তিনি কেবল তাদের মঙ্গলের জন্য সৎ উপদেশ প্রদান করতে চান। বিদুর ছিলেন কৌরব রাজ-বংশজাত, এবং যদিও তিনি জানতেন যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেই বংশের সকলেই নিহত হয়েছে, তবুও তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে, তাঁকে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত করা যায় কি না। বিদুরের মতো মহাত্মা যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের দর্শন করেন, তখন তিনি কেবল তাদের মায়ার বন্ধন থেকেই মুক্ত করতে চান। বিদুর এইভাবে তাঁর শ্রীগুরুদেবকে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করে, কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

এতদ্‌যঃ শৃণুয়াদ্‌রাজন্‌ রাজ্ঞাং হর্যর্পিতাত্মনাম্‌ ।
আয়ুর্ধনং যশঃ স্বস্তি গতিমৈশ্বর্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩১ ॥

এতৎ—এই; **যঃ**—যিনি; **শৃনুয়াৎ**—শ্রবণ করেন; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **হরি**—পরমেশ্বর ভগবানকে; **অর্পিত-আত্মনাম্**—যাঁরা তাঁদের আত্মা ভগবানকে নিবেদন করেছেন; **আয়ুঃ**—আয়ু; **ধনম্**—ধন; **যশঃ**—খ্যাতি; **স্বস্তি**—সৌভাগ্য; **গতিম্**—জীবনের চরম লক্ষ্য; **ঐশ্বর্যম্**—জাগতিক ঐশ্বর্য; **আপ্নুয়াৎ**—লাভ করেন।

অনুবাদ

হে রাজন্! যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পিত রাজাদের এই সমস্ত আখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁরা অনায়াসে দীর্ঘায়ু, ঐশ্বর্য, যশ ও সৌভাগ্য লাভ করেন, এবং চরমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পান।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধের 'প্রচেতাদের প্রতি নারদের উপদেশ' নামক একত্রিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।

চতুর্থ স্কন্ধ সমাপ্ত